মাতৃপ্রসঙ্গ

বিশ্বজননী অতি সাধারণী

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

প্রচলিত একটি গানে আছে, ''বিশ্বজননী সেজে ভিখারিনি জগতে তারিতে এলে মা আবার।'' যদি এই ভিখারিনি শব্দটি নিয়ে আর একটু ভাবি তাহলে দেখব যে, শব্দটি হয়তো খুব সুপ্রযুক্ত নয়। কিছু ভক্তের এ-ভাবনাটি ব্যক্তিগত ধারণা হতে পারে, তবু মনে হয় তাঁদের যুক্তিটি বিবেচনার যোগ্য। ভিখারিনির সঙ্গে অভাব ও অভাববোধের সম্পর্ক, যা পূরণের প্রার্থনায় সে পরমুখাপেক্ষী। ভাবহীনতা অভাববোধ আনে। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ভাবে সদাই পূর্ণ, তাই একটা সময়ে প্রবল দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁর অভাব ছিল না। কাপড় ছিঁড়ে গেলে গিঁট দিয়ে পরেছেন কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ সেলাই করে কাপড় পরা পছন্দ করতেন না, তবু কারও কাছে হাত পাতেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ শরীর ত্যাগের আগে যে-মূল্যবান উপদেশটি দিয়ে গিয়েছিলেন তা ছিল—''দেখ, কারও কাছে একটি পয়সার জন্য চিতহাত করো না। তোমার মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্যে যদি কারও কাছে হাত পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।... বরং পরভাতা ভাল তবু পরঘোরো ভাল নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট করো না।''[১]

আদতে শ্রীরামকৃষ্ণের এ-উপদেশ শ্রীশ্রীমাকে উপলক্ষ্য করে আমাদের জন্য। আমাদের মধ্যে যাঁদের নিজের অন্নসংস্থানের জন্য পরের ওপর নির্ভর করতে হয় তাঁরা খুব ভাল জানেন একথাটির অর্থ। দ্বিতীয় অংশটি আরও মারাত্মক। পরনির্ভর হয়েও যদি মাথার ওপর নিজের ছাদ থাকে সেটি তবু ভাল, কিন্তু সেটিও না থাকলে তার দুর্ভাগ্যের শেষ নেই। শ্রীশ্রীমা দুটি উপদেশকেই আমাদের শিক্ষার জন্য জীবনে পালন করে দেখিয়ে গেছেন। কখনও কারও কাছে হাত পাতেননি তো বটেই, কামারপুকুরের ঘরটিকেও সযত্নে রক্ষা করেছেন। তিনি আজন্ম দাত্রী, গ্রহিত্রী নন; তিনি 'জ্ঞানদায়িনী', 'ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রী'। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদ ভক্তদের বাছাই করে নিয়েছিলেন, বিষয়ী মানুষকে সহ্য করতে পারতেন না, তাদেরকে রাসমণির করা বিল্ডিং দেখতে যেতে বলতেন আর তাদের বসা জায়গায় গঙ্গাজল ছিটোতে বলতেন। কিন্তু মা তো বাছাই করেন না! করবেন কী করে? সকলের মা যে! তাঁর কাছে দোষী, নির্দোষ, ভাল, মন্দ যেই আসুক, তাদের জন্য শ্রীমায়ের স্নেহের দ্বার অবারিত। 'অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্ স্বাঙ্কে

গৃহীত্বা'—তিনি নানা দোষে দোষী আমাদের কোলে তুলে নিয়ে বিনা কারণে কৃপাদান করেন। যিনি আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এ-তিন শরীরেরই অন্ন জোগান, তাঁকে কে কী দিতে পারে? কিন্তু এ-অন্ন জোগাতে তাঁকে পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়ে আসতে হয়নি, বরং ঐশ্বর্যবিহীন, অতি দরিদ্র জননী হয়ে, অনন্ত স্নেহ-ভালবাসায় ভরা বুক নিয়ে তিনি এ-জগতে এসেছিলেন। এই সাধারণত্বই তাঁর ঐশ্বর্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের অন্নকষ্ট নিরসনের জন্য তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন। এতে নরেন্দ্রনাথের আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তিনি ঠাকুরকে তিরস্কার করলে ঠাকুর বলেছিলেন, ''ওরে, তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি!''[২] ঠিক একই কারণে, ঠাকুরের সন্তানদের বরানগর মঠে প্রবল দারিদ্র্যের সময়, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ''ঠাকুর, তুমি এলে, এই ক-জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায় আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়।''[৩] মা মুখে বলছেন 'আমার প্রার্থনা', কিন্তু সুরটি প্রার্থনার নয়, এটি আজকের ভাষায় দাবি—সনদ পেশ, জোর ফলানো, এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় ভক্তির তমঃ। শ্রীরামকৃষ্ণও তা মেনে নিতে বাধ্য, কারণ তাঁর অভীপ্সিত কাজ যা শ্রীমায়ের ওপর ছেড়ে রেখে গেছেন, তা পূর্ণ করতে এটি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শুধু একবারই মায়ের কাঙালিনির ভাব আমরা দেখেছি। পুরী পৌঁছেই জগন্নাথদর্শনে যেতে চাইলে পাণ্ডা গোবিন্দ যখন পালকি আনতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে বারণ করে মা বলেছিলেন, ''না, গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে, আমি দীনহীন কাঙ্গালিনীর মতো তোমার পেছন পেছন জগন্নাথদর্শনে যাব।''[৪] ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে বিচলিত হয়ে মা বলেছেন, ''হে ঠাকুর, আর কতদিন তুমি এই সরকারের অনাচার সইবে?''[৫]—কথায় কৈফিয়ত চাওয়ার সুর। এত অনাচার দেখতে হচ্ছে বলে অভিমানও জানাচ্ছেন। অপরের জন্যও হাত পাততে রাজি নন। অতি সাধারণের অসাধারণত্বের প্রকাশ এটুকুই।

কিন্তু মায়ের জন্মের আগে তাঁর মা-বাবার অসাধারণ দর্শন হয়েছিল। জননী শ্যামাসুন্দরী দেখলেন বেলগাছ থেকে একটি শিশুকন্যা নেমে এসে পেছন থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ''আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।''[৬] আবার সেইসময়ে একদিন সংসারে অভাবের চিন্তায় মগ্ন পিতা স্বপ্নে দেখলেন, একটি শিশুকন্যা এক-গা গয়না পরে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। অবাক হয়ে সে কে জিজ্ঞাসা করায় সে কচি গলায় উত্তর দিলে, ''এই আমি তোমার কাছে এলুম।''[৭] দরিদ্র, সরল ব্রাহ্মণ ভক্তের ঘরে জন্ম হল লক্ষ্মীর। ঘরে লক্ষ্মীশ্রী এলেও আর্থিক সচ্ছলতা এল না, পাছে সাধারণের সে-আবরণ খসে যায়। তাই শ্যামাসুন্দরী খেতে চাষের তুলো তুলছেন, আর খোলা আকাশের নিচে খেতের আলে শিশু লক্ষ্মী শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। একটু বড় হলে ওই তুলোয় পইতে কেটে মাকে সাহায্য করছেন। ছোট ভাইদের নিয়ে আমোদরে গঙ্গা নেয়ে, ভাইদের সঙ্গে মুড়ি খেয়ে বাড়ি আসছেন। তবু মাঝে মাঝে তাঁর অসাধারণত্ব বেরিয়ে পড়ত। জগদ্ধাত্রীপুজোয় একবার হলদেপুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল, মা জগদ্ধাত্রীর সামনে বালিকা সারদাকে দেখে মূর্তি

আর মেয়েটির মধ্যে তফাত পেলেন না। তাঁর বুক দুরদুর করতে লাগল, তিনি ভয়ে পালিয়ে গেলেন। বাড়ির গোরুর জন্য দলঘাস কাটার বয়স নয় তবু মা কাটতেন, আর দেখতেন তাঁরই মতো আর একটি মেয়ে ঘাস কেটে পাড়ে তুলে রাখছে। নিজের স্বরূপের দর্শনে অবাক হতেন নিজেই। এক অদ্ভুত ভালবাসা আর সহমর্মিতা দিয়ে সংসারের সবকিছুকে জড়িয়ে রাখার আনন্দে মেয়েটির সঙ্গে কারও বিবাদ হত না। সবাই অবাক হত কিন্তু ওই পর্যন্তই, এর বেশি কিছু বোঝা সম্ভব ছিল না। গর্ভধারিণী মা যেন বুঝেছিলেন শেষ বয়সে : ''মাগো, তুই যে আমার কে মা! আমি কি তোকে চিনতে পারছি, মা?''[৮] এই চেনা-অচেনার দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাঁর এবারের তারণক্রিয়া।

কিন্তু তারণের আগে সাধন। ঠাকুরের সাধনপথ অভিনব, সোচ্চার, মানুষের বোধ-বুদ্ধির বাইরে, তাই 'পাগলা বামুন' উপাধি লাভ। কিন্তু সারদার সাধনজীবন জানবে কে? তাঁকে দেখতেই পায় না কেউ। খাজাঞ্চি বলেন, ''তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনো দেখতে পাইনি।''[৯] লোকচক্ষুর অন্তরালে এক নীরব অথচ নিশ্চিন্ত জীবনকে গড়ে তোলা। শ্রীরামকৃষ্ণ লিখতে পড়তে পারতেন, সংস্কৃতে কথা বললে বুঝতে পারতেন কিন্তু নিজে বলতে পারতেন না। শাস্ত্র পড়েননি, কিন্তু সাধক পণ্ডিতদের কাছে শুনেছেন অনেক এবং অদ্ভুত শ্রুতিধরত্বে তাকে মনে নথিবদ্ধ করেছেন। থাকতেন মন্দিরে, ভক্ত ও সাধুসঙ্গের মাঝখানে, নিরন্তর সৎকথার স্রোতে ভেসে। সারদার তার কিছুই নেই। গ্রাম্য পরিবেশে, গ্রাম্য কোঁদলের মধ্যে, সামাজিক আচার-বিচারকে মান্যতা দিয়ে, প্রথাগত শিক্ষাবিহীন জীবনে বেড়ে ওঠা। কোনওক্রমে পড়তে শিখেছিলেন তাও হৃদয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সবার কাছে তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, ''ও সারদা-সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।''[১০] বললেন, ''ছাইচাপা বেড়াল।''[১১] হৃদয়কে সাবধান করে দিলেন যে, ও রুষ্টা হলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ক্ষমতা নেই তাকে রক্ষা করেন। সাধনের শেষে তাঁর ভালবাসায় ভরা মনটির মধ্যে দেখা গেল মাতৃস্নেহের এক অদ্ভুত বিকাশ, এবং সেটিই তাঁর আবরণ হয়ে দাঁড়াল। তাকে ভেদ করে তার উৎসমুখটি দেখার কথা মনেই ওঠে না কারও। ওলা মিছরির পানায় মুগ্ধ মানুষ বড়জোর মিছরির খবর রাখতে পারে, তার উৎস জানার প্রয়োজন আর কার থাকে! স্নেহ আস্বাদনে বিভোর সন্তান মায়ের রূপটিকে মনে রাখতে পারে, তাঁর স্বরূপ খোঁজ করার মানুষ আর কজন! ''ধরায় যখন দাও না ধরা/ হৃদয় তখন তোমায় ভরা''—হৃদয়কে ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েই তো তাঁর এ-ধরায় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা।

এতটাই বাইরে যে, যখন 'একা একা' কামারপুকুরে আছেন গিঁট দেওয়া কাপড় পরে, আক্ষরিক অর্থে হাতে বোনা শাক আর ভাত খেয়ে—সরু লালপাড় শাড়ি, হাতে বালা নিয়ে গাঁয়ের লোকের সমালোচনা শুনতে শুনতে, আত্মীয়দের কুমন্ত্রণায় দক্ষিণেশ্বরের টাকা বন্ধ হওয়ায় ও তাদের উপেক্ষায় চরম দারিদ্র্যে দিন কাটছে, তখন কাউকে সে-বিষয়ে একটিও কথা না বলায় সে-ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। খানিক জানা গেল যখন শ্যামাসুন্দরী তাঁর মেয়েকে দেখতে এসে তার দুরবস্থা দেখে তাকে নিজের কাছে জয়রামবাটীতে নিয়ে গেলেন। কামারপুকুরে স্নান করতে যাওয়ার সময় মা তাঁর সামনে চারজন আর পেছনে চারজন বধূকে দেখতেন তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে। নিজের মধ্যে অষ্টসখী পরিবৃত দুর্গার সত্তা অনুভব করেও, শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতার ভক্তদের ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে যাওয়ার আগে, কামারপুকুরে জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছেন তাঁর যাওয়া উচিত কি না। যখন প্রসন্নময়ী

মত দিয়ে বললেন, ''সে কি গো? তুমি অবশ্যি যাবে। তারা শিষ্য, তোমার ছেলের মতো। একি একটা কথা! যাবে বইকি!''[১২] তখন যাওয়া স্থির করলেন। ''তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনাজালে/ হে ছলনাময়ী!'' যিনি মায়াতীত সত্তা, মায়ার রাজ্যে এসে নিজেকে লুকোবার কী আকুল প্রচেষ্টা। একবার গোলাপ মাকে শ্রীশ্রীমা ভেবে এক ভক্ত প্রণাম করতে উদ্যত দেখে গোলাপ মা মাকে দেখিয়ে দিলে মা মজা পেয়ে আবার গোলাপ মাকে দেখিয়ে দিলেন। বার কয়েক এভাবে চললে গোলাপ মায়ের হুংকার। জয়রামবাটীতে মেয়ে হয়ে থাকা, তাই সে-মুখ দর্শনের অধিকারী অনেকেই। কিন্তু কলকাতায় শ্রীশ্রীমা এক গলা ঘোমটা দেওয়া কাপড়ের পুঁটুলি। গঙ্গাস্নান করতে যান গোলাপ মায়ের পেছনে আঁচলে মুখ ঢেকে নববধূটির মতো। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তাঁর মুখ দেখেননি। মায়ের ভাইয়েরা তাঁকে নিজের দিদি বলেই জানতেন। কালীমামা গিরিশ ঘোষকে বললেন, ''তোমরা দিদিকে 'মা জগদম্বা, জগজ্জননী' ইত্যাদি কতই বল। কই, আমরা এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি—আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।''[১৩] গিরিশবাবু তাঁর স্বভাবজাত বিশ্বাসের জোরে তেজে বলে উঠলেন, ''কি বলছ? তুমি এক সাধারণ পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে; যজন-যাজন, পঠন-পাঠন ব্রাহ্মণের কাজ ছেড়ে চাষবাস নিয়ে জীবন কাটাচ্ছ। তোমাকে যদি [কেউ] একটা চাষের বলদ দেবে বলে তো তুমি তার পেছনে পেছনে অন্তত ছ-মাস ঘুরতে থাক। আর অঘটন-ঘটনপটিয়সী মহামায়া তোমাকে দিদিরূপে সমস্ত জীবন ভুলিয়ে রাখতে পারেন না? যাও, যদি ইহ ও পরজন্মে মুক্তি চাও তো এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও। আমি বলছি, যাও।''[১৪] কালীমামা সে-তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে দিদির কাছে গেলেন বটে কিন্তু শ্রীমায়ের ''তুই এ কি করছিস'' শুনেই সে-ভাব কোথায় চলে গেল, ফিরে এলেন। গিরিশবাবু শত চেষ্টাতেও আর তাঁকে পাঠাতে পারলেন না। দেবত্বের বিশ্বাসে রুচি হল না। ''মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে''—এ-বিশ্বাসের ফাঁদে সবাই বন্দি, শুধু বন্দি নয়—বন্দিত্বের বোধও নেই।

শ্রীশ্রীমা দীক্ষা দিয়েছেন অনেক তবে দীক্ষার পরে ভাগ্যবানেরা শুনতেন শ্রীমা বলছেন ঠাকুরকে দেখিয়ে যে, উনিই গুরু আবার উনিই ইষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রশ্ন হত, তাহলে তিনি কে। তিনি বলতেন, ''আমি তোমাদের মা।'' এর অর্থ যে সবাই বুঝতে পারতেন একথা বলা চলে না। কিন্তু পরে অনেকেই বুঝেছিলেন যে, গুরু ও ইষ্টকে নিয়ে যাঁর জন্য সাধন তিনি নিজে এসে মা-রূপে তাঁদের কোলে তুলে নিয়েছেন। এটি এক কথায় বুঝেছিলেন লাটু মহারাজ যখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, ''ওরে লেটো! তুই এখানে বসে আছিস্; আর উনি যে নবতে রুটি বেলার লোক পাচ্ছেন না।''[১৫] শ্রীমা যে তার ইঙ্গিত দেননি এমন নয়, সন্তানদের বলেছেন, ''ভয় কি, বাবা সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?''[১৬] যার আশ্রয় নিলে মানুষ অভীঃ হতে পারে তিনি কে হতে পারেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''কি জানো, অমৃতকুণ্ডে কোনও রকমে পড়া। তা স্তব করেই হোক অথবা কেউ ধাক্কা মেরেছে আর তুমি কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল।''[১৭] শ্রীমা স্থূল শরীরে নেই, তাঁর কায়া আজ করুণার্দ্র দৃষ্টি নিয়ে চিত্রে উপস্থিত। একটু মন দিয়ে সে-চোখের দিকে দেখলে আজও তাঁর দেওয়া আশ্বাস প্রাণে বেজে ওঠে। তাই শ্রীমায়ের ভালবাসার কথা পড়ে, শুনে, আলোচনা করে, যদি আমাদের মনে তাঁর প্রতি একটু ভালবাসা জেগে ওঠে, তাহলে আর ভয় নেই। শ্রীমায়ের অনন্ত ভালবাসার সঙ্গে আমাদের

ভালবাসার যোগসাধন আমাদের মায়ার ফাঁদ কেটে অনন্তে উড়ে যেতে সাহায্য করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, অনন্তের সামনে বিরাট এক পাঁচিল আর তাতে একটা বড় ফাঁক। কথামৃতকার শ্রীম সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলেন যে মায়ার নিশ্ছিদ্র আবরণে শ্রীরামকৃষ্ণই সেই ফাঁক, যার মধ্য দিয়ে অনন্তের দেখা মেলে। কিন্তু আমরা তো সে-মায়াপাঁচিলের দিকে পেছন ফিরে তার সৃষ্ট এ-জগৎবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে আছি। মায়ার অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করা আমাদের সেই ফাঁকটির দিকে মুখ ঘোরানোর জন্য বিদ্যারূপিণী মহামায়াকে রেখে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান দিতে। সারদাও বিশ্বজননীরূপে ঐশ্বর্যবিহীনা হয়ে সে-ভার তুলে নিয়েছেন কাঁধে। পার্থিব, অপার্থিব কোনও ঐশ্বর্যের প্রকাশ নেই। থাকবে কী করে? তিনি যে উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র এমনকী মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও জননী, 'নিচুর কাছে নিচু' হয়ে সকলকে তুলে আনতে হবে তাঁকে। ভগবানকে ভালবাসা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, তাই ভগবান নিজে মাতৃরূপ ধরে সকলকে ভালবেসে তাঁর দিকে সকলের মুখ ঘোরানোর সাধনায় লেগে পড়েছেন—সেই অনন্তের ফাঁকটি গলে অনন্তে মিশে যাওয়ার সহজ পথটি দেখাতে। ''চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে/ অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহি রে''—তাঁকে যাঁরা চর্মচক্ষে দেখেছিলেন তাঁদের মানবজন্ম ধন্য তাঁর স্নেহসুধা আস্বাদন করে, আর আমরা যারা তাঁকে চোখে দেখিনি তারাও ধন্য তাঁর ছায়া-কায়া সমতুল ছবিতে করুণানির্ঝর চোখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু তাঁকে অন্তরে স্বরূপে দর্শন করতে যে-আলো দরকার সে-আলো আমাদের নেই, আর সে-আলোর খোঁজ দিতেই তাঁর আমাদের দিকে চেয়ে থাকা। ''জীবন যখন শুকায়ে যায়/ করুণাধারায় এসো''—তাঁকে অন্তরে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় যখন জীবন শুষ্ক বোধ হবে তখনই তিনি করুণাধারায় আমাদের কাছে আসবেন—'রসো বৈ সঃ' সেই অনন্তের রসে স্নিগ্ধ করে দিতে। ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১২), পৃঃ ১১৭ [এরপর, *শ্রীমা সারদা দেবী*]

২। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৬

৩। *শ্রীমা সারদা দেবী*, পৃঃ ২৫৮

৪। তদেব, পৃঃ ১৩০

৫। সম্পাদনা : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতরূপে সারদা* (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : কলকাতা, ২০১২), পৃঃ ৫১৯ [এরপর, *শতরূপে সারদা*]

৬। *শ্রীমা সারদা দেবী*, পৃঃ ১৫

৭। তদেব (পাদটীকা)

৮। তদেব, পৃঃ ২১

৯। তদেব, পৃঃ ৬৭

১০। তদেব, পৃঃ ৯২

১১। তদেব

১২। তদেব, পৃঃ ১২৮

১৩। তদেব, পৃঃ ১৭১

১৪। তদেব

১৫। *শতরূপে সারদা*, পৃঃ ৫২

১৬। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০১২), অখণ্ড, পৃঃ ৮৫

১৭। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ১৮১